শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির ঝুঁকি ও করণীয়

বিশ্ববিদ্যালয় | মো. রেযাউল করিম

গবেষক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তথ্য গণমাধ্যমসহ সর্বজন জ্ঞাত হলেও ইউজিসির এ ক্ষেত্রে কিছু করণীয় বা ক্ষমতা নেই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিতে পারে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হ্রাস ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণসহ তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটিতে বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেন এবং ১৩টিতে রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, আত্মীয়তা, আঞ্চলিকতা, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রভাষক নিয়োগের অভিযোগ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন প্রতিবেদনটিকে পক্ষপাতমূলক, বানোয়াট, কল্পনাপ্রসূত বলে নিজ নিজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত প্রতিবাদলিপিতে উল্লেখ করেছে।

প্রত্যাখ্যানের রেওয়াজে গিয়ে তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে রাজনীতিকরণসহ দুর্নীতির মহোৎসবকে আরও বহুগুণে উৎসাহিত করে জনগণের করের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মেধাশূন্য করাকে উৎসাহিত করেছেন। সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে দায় এড়ানো তথা সমস্যা জিইয়ে রাখার পথ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রবণতা নব্বই দশকে গণতান্ত্রিক সরকারের অভ্যুদয়ের পর শুরু হয়ে তা ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিচয় ও সম্পৃক্ততা প্রমাণ না দিয়ে বা না করে কিছু কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ বিষয়টি কল্পনাতীত। এতে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের সাতশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকায় বাংলাদেশের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অনুপস্থিত। টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কোনো বোধোদয় হয়েছে বলে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে তা প্রতীয়মান হয় না। নিজেদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করার মধ্যে যে মহত্ত্ব তারা কি তা দেখাতে পেরেছেন? এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এখনও রহস্যজনকভাবে নীরব! সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয় না তা সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলররা ও শিক্ষক ফেডারেশন অস্বীকার করতে পারবেন? অপ্রিয় হলেও সত্য, শুধু বুয়েটসহ কিছু কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ ব্যতীত অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে মূলত নিজেদের ও ক্ষমতাসীন দল সমর্থক শিক্ষক সদস্য তথা 'ভোটার সংখ্যা' বৃদ্ধি করতে নিয়োগ পরীক্ষার আগে থেকেই কাকে কাকে নেওয়া হবে তা ভিসির নেতৃত্বাধীন কমিটি ঠিক করে রাখার বিষয়টি অপ্রিয় হলেও বাস্তব।

দুর্নীতি স্থান-কাল-পাত্রভেদে সর্বযুগে, সব দেশে, সব জাতিতে ও সব প্রতিষ্ঠানে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে– অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও এসব বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে দুর্নীতি থাকলেও তা সহনীয় মাত্রায় বিদ্যমান। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিরই অংশ। তাই শিক্ষক নিয়োগে শতভাগ সততা আমরা আশা না করলেও শতভাগ অনিয়মের ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনার মূলে বহুবিধ কারণ, ঝুঁকি বা 'রেড-ফ্লাগ' রয়েছে।

৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিজস্ব বিধিমালা রয়েছে। সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রয়োজন এমনকি ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছামাফিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো নিয়ন্ত্রক বা ভূমিকা নেই। উল্লেখ্য, সিন্ডিকেটের গঠন কাঠামো মোতাবেক সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের কার্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের সিন্ডিকেটের সদস্য হওয়ার সুযোগ বিদ্যমান। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশাসন নিজেদের ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট চাকরিপ্রার্থীর প্রভাষক পদে নিয়োগ নিশ্চিত করতে নিজেদের অভিপ্রায় মোতাবেক নিয়োগ-বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন করার ঘটনা অহরহ ঘটে। কার্যকর জবাবদিহির অনুপস্থিতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে অপব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিয়োগ সংশ্লিষ্টদের একাংশ নিজেদের অনুসারী ও ভোটার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষকের চাহিদার অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ভিসি নিয়োগে সুনির্দিষ্ট ও দৃশমান ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও সরকারের নীতিনির্ধারকদের একাংশকে যারা প্রভাবিত করতে পারেন, তারাই ভিসি হওয়ার সুযোগ পান। এমনও উদাহরণ রয়েছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাগত জীবনে নিজ নিজ বিভাগে 'বিভাগীয় চেয়ারম্যান' পদে দায়িত্ব পালন করারও সুযোগ পাননি, তারাও রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক ও সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে ভিসি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এভাবে নিয়োগ পাওয়ার পর এদের অনেকেই প্রতিদান হিসেবে রাজনৈতিক চাপ ও সুপারিশসহ আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছেন এবং করে চলেছেন। ভিসিদের একাংশও স্বীকার করেছেন, প্রভাষক পদে দুর্নীতির মূলে রয়েছে পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা ও ব্যক্তিগত দৃঢ়তার চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে ভিসি পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রক্রিয়া বা সংস্কৃতি।

প্রভাষক নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি হলেন ভিসি এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রোভিসি। ভিসি পদে রাজনৈতিক বিবেচনার নিয়োগে সিন্ডিকেটে সরকার তথা ভিসির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভিসি তার অভিপ্রায়ে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে পারেন। ভিসির ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের এই সুযোগ প্রভাষক নিয়োগের দুর্নীতির ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। কাজে নিয়োগ সঠিকভাবে হবে কি হবে না একজন ভিসির ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে গত তিনজন ভিসির মেয়াদকালে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রায় শত শত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও বর্তমান ভিসির আমলে রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও ওই ভিসির ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও সততার কারণে একই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ প্রায় বন্ধ রয়েছে।

এমআইটি, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজসহ বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ নীতিমালা বা বিধি রয়েছে। একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া কয়টি ধাপে সম্পন্ন হবে, কোন ধাপে কী কী কর্ম সম্পাদিত হবে, কীভাবে হবে, কারা কী দায়িত্ব পালন করবেন, এমনকি নিয়োগ পরীক্ষায় সব প্রার্থীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হবে– সে বিষয়ে নির্দেশনা থাকলে বাংলাদেশে তা অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাংশ তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক এমনকি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ বিধিমালা, নির্দেশনা প্রণয়ন ও সংশোধন করতে দেখা যায়। কার্যত একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নিয়োগ বিধিমালার অনুপস্থিতি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

ইউজিসির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দ ব্যতীত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ঘটনা নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তথ্য গণমাধ্যমসহ সর্বজন জ্ঞাত হলেও ইউজিসির এ ক্ষেত্রে কিছু করণীয় বা ক্ষমতা নেই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দিতে পারে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হ্রাস ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণসহ তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ভিসিরা জানেন, তারা দেশের আইনের ঊর্ধ্বে। কারণ নিকট অতীতে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় শাস্তিসহ দেশের প্রচলিত আইনে বিচারের মুখোমুখি করার ঘটনা বিরল। একটি সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে ইউজিসির চেয়ারম্যান ও সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত দুটি তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্নীতির প্রমাণ মিললেও কমিটি দুটির সুপারিশের আলোকে ওই ভিসির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বরং তাকে পুরো মেয়াদ শেষ করার সুযোগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আমাদের সমাজেরই অংশ। শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক সমাজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আশা করা অমূলক ও অবাস্তব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার হিসেবে প্রভাষক নিয়োগে শিক্ষক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে দুর্নীতি হ্রাস করতে হলে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টিকারী উপাদান তথা বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন রাজনৈতিক বিবেচনায় হলেও ভিসি পদে পেশাগত অভিজ্ঞতা, সততার রেকর্ড পর্যালোচনা করে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ নিশ্চিত করা। এতে সরকারের যেমন ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, যথেচ্ছভাবে নিয়োগ বন্ধের মাধ্যমে জনঅর্থের অপচয় রোধ হবে, যা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোক বাস্তবিক অর্থে মেধা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

mdrezaulkarim1971@gmail.com